উত্তাল মার্চ

খোলা হাওয়া

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি কি বন্ধ হবে?

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ৭ মার্চের গুরুত্ব অপরিসীম। ঢাকার রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় লাখ লাখ মানুষের সামনে এদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে ভাষণ দেন, তাতে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটিও ছিল। সেদিন ওই জনসভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং পরদিন বেতারে যাঁরা বক্তৃতাটির প্রচার শুনেছিলেন, তাঁদের কারও মনে এ নিয়ে কোনো দ্বিধা ছিল না। না, বঙ্গবন্ধু এ কথাটি বলেননি যে আজ থেকে বাংলাদেশ নামের একটি রাষ্ট্রের জন্ম হলো, অথবা আজ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য একটি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর ১৭ মিনিটের ওই বক্তৃতায় তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে আর নয়, পথ আলাদা করার সময় এসেছে। তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছিলেন দেশবাসীকে। যার যা আছে, তা নিয়ে দখলকারীদের রুখে দাঁড়ানোর আহ্বানও তিনি জানিয়েছিলেন। তারপরও একটা শেষ সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন পাকিস্তানিদের, কিন্তু দেশবাসীর মনে এ ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ ছিল না যে পথ আলাদা হয়েই গেছে।

২৬ মার্চ পাকিস্তানিরা যে হত্যাযজ্ঞ চালায় সারা বাংলাদেশে, তার ক্ষেত্রটি দীর্ঘদিন ধরেই প্রস্তুত হচ্ছিল। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে নিয়ে ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন এবং ১৯৭০-এর নির্বাচনে বাঙালিদের বিজয়এই পুরো প্রক্রিয়াটিই পাকিস্তানিদের মনে ক্রোধ ও প্রতিহিংসা জাগাচ্ছিল। ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ পাকিস্তানিরা ঠিকই পড়তে পেরেছিল। এ জন্য তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। ওই হত্যাযজ্ঞ শুরু করার পর পাকিস্তানি সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান একটি বেতার-টিভি ভাষণে এর পক্ষে যে সাফাই গেয়েছিলেন, তাতেও বঙ্গবন্ধুকেই দায়ী করেছিলেন পুরো বিষয়টির জন্য। পাকিস্তানিরা ছিল যুক্তিহীন, ক্ষমতার মোহে অন্ধ এবং অসভ্য তারা যা করেছে তার কোনো যৌক্তিকতা কোনো বিবেচনাতেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এখনো তারা ’৭১-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেনি, নিজেদের দোষও স্বীকার করেনি। এটি অবশ্য তাদের যে চরিত্র ’৭১-এ আমরা দেখেছি, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তারা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে প্রত্যাখ্যানের একটি চূড়ান্ত ঘোষণা হিসেবেই দেখেছিল। জননেতা মওলানা ভাসানীও বঙ্গবন্ধুর অবস্থানটিকে সঠিকভাবে শনাক্ত করেছিলেন। তিনি নিজেও পল্টনের এক জনসভায় পাকিস্তানকে ‘খোদা হাফেজ’ জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ ৭ মার্চের পর বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের নির্দিষ্ট একটি গন্তব্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

১৯৭১ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলাম এবং ৭ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আমিও রেসকোর্সের জনসভায় গিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি এক বিদেশি সাংবাদিককে অনুবাদ করে দেওয়ার বিনিময়ে তাঁর সঙ্গে মঞ্চের সামনেই সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় ঢুকতে পেরেছিলাম। বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিতে শুরু করলে আমার মনে হয়েছিল, এ ভাষণ অনুবাদ করার মতো কঠিন কাজ আর কিছু নেই তাছাড়া তিনি যা বললেন, তার একটি শব্দও না শুনে থাকার উপায় নেই, অথচ তাৎক্ষণিক অনুবাদ করতে গেলে ভাষণটি নিরবচ্ছিন্নভাবে শোনা সম্ভব নয়। সাংবাদিক ভদ্রলোক আমার মনোভাব বুঝে বলেছিলেন, পরে অনুবাদ করে দিলেই চলবে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সবচেয়ে রাজনীতি-নিস্পৃহ মানুষটিকেও বিদ্যুতের মতো স্পর্শ করেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় বাংলাদেশের প্রতিটি বাড়িতে এই ভাষণ নিয়ে কথা বলেছে মানুষ। পরদিন সকালে যখন রেডিওতে ভাষণটি প্রচার হয়, মানুষ সম্মোহিতের মতো তা শুনেছে, তারপর ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের এই ঘটনাটির আমিও একজন সাক্ষী। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকে আমাকে এবং আমার মতো লাখ লাখ মানুষকে বলা হচ্ছে, এই ভাষণ-টাষণ আবার কী, এর তো কোনো গুরুত্বই ছিল না। শেখ মুজিব স্বাধীনতা চাননি। তিনি বক্তৃতার শেষে ‘জয় পাকিস্তান’ স্লোগান দিয়েছিলেন। অবাক, মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে আমি যা শুনিনি, ঘরে বসে কিছু লোক তা শুনলেন এবং আমাদের তা বিশ্বাস করতে বললেন। এই ‘কিছু লোকের’ ভেতর যে স্বাধীনতার ঘোষিত ও অঘোষিত শত্রুরাই রয়েছে, তা নয়। এক সময় বাম রাজনীতি করতেন, এমনকি ’৭১-এ দুর্ধর্ষ ছাত্রনেতা ছিলেন, এমন লোকও রয়েছেন।

৭ মার্চের ইতিহাসকে মুছে ফেলার এবং তা সম্ভব না হলে বিকৃত করার প্রচেষ্টা গত পাঁচ বছরে খুব জোরেশোরে চললেও এর শুরু ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালের পর থেকে। যাঁরা মন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেনি, তাঁরা এই

প্রয়াসে নেতৃত্ব দিয়েছে, কিন্তু এতে যোগ দিয়েছেন ক্ষমতালোভী কিছু রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবী। ইতিহাস বিকৃতির এই প্রচেষ্টাটি যে শেষ পর্যন্ত একটি অভিযানে রূপ নেয়, সেও তাঁদের নিরলস পরিশ্রমে। এবং শুধু ৭ মার্চ নয়, ১৯৪৮ থেকে শুরু হওয়া বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সমগ্র আন্দোলনটি, বিশেষ করে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, বিকৃতির শিকার হয়েছে। আমরা যাঁরা ষাটের দশকে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনকে কাছে থেকে দেখেছি এবং ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকেও দেখেছি, তাঁদের জানানো হলো, এই দীর্ঘ সংগ্রামের কোনো অস্তিত্ব নেই ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ পর্যন্ত এত যে ঘটনা ঘটে গেল, তারও কোনো মূল্য নেই। বরং ২৬ মার্চ (আগে বলা হতো ২৭ মার্চ) মেজর জিয়ার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়ে গেল। বাংলাদেশের লাখ লাখ স্কুলপড়ুয়াকে এই 'হঠাৎ যুদ্ধ' তত্ত্বটি শেখানো হলো। তারা জানল, বঙ্গবন্ধু বলে কেউ ছিলেন না। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম-ত্যাগ-তিতিক্ষা এসবের কোনো মূল্য নেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে মেজর জিয়ার এক ঘোষণায়। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক নেতা কয় বছর আগে আমাদের হতভম্ব করে ঘোষণা করলেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা চাননি মেজর জিয়া না থাকলে মুক্তিযুদ্ধ হতো না।

পরিতাপের বিষয়, জিয়া-প্রশস্তি গাইতে গিয়ে ইতিহাসের সত্যগুলোকে বিকৃত করেছেন শুধু ওই এককালের ছাত্রনেতাই নন, অনেক পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীও। তাঁরা অনেকেই বিএনপির দুই শাসনামলে নানা সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন। এসব সুযোগ-সুবিধা এবং ক্ষমতার একটুখানি ভাগের আশায় তাঁরা সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন, বিবেককে রুদ্ধ করেছেন।

এর প্রতিক্রিয়া এসেছে বঙ্গবন্ধুর দল এবং তাঁর অনুসারীদের থেকে। জিয়াউর রহমানকে তাঁরা ইতিহাস থেকে ছেঁটে ফেলতে চেয়েছেন। অথচ জিয়ার ২৭ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাটি, যেটি তিনি বঙ্গবন্ধুর নামেই দিয়েছিলেন, ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খুবই প্রেরণাদায়ক। জিয়া ওই ঘোষণা না দিলেও যুদ্ধ হতো ইতিহাসের এই অনিবার্যতা তখন কোনো একজন মানুষের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। এমনকি বঙ্গবন্ধুর ওপরও নয়। তাঁকে যদি পাকিস্তানিরা মেরেও ফেলত, তারপরও যুদ্ধ হতো। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করা কেন?

যারা ইতিহাস বিকৃতি করে ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং ভেদবুদ্ধির জন্য, তারা ইতিহাসের এই শক্তিটিকে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারার মতো চিন্তার দৃঢ়তা, গভীরতা ও স্বচ্ছতা থাকলে তারা নিশ্চয় ইতিহাস বিকৃতির পথে যেত না।

কিন্তু ইতিহাস বিকৃতির অসুস্থ চর্চাটি বেছে বেছে আমাদের সবচেয়ে গৌরবের জায়গায় ক্ষত সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে। একটি জাতির ইতিহাস-গৌরব কেড়ে নিলে সে জাতির কী থাকে? এবং এই ইতিহাস-গৌরব হরণ করার জন্য বিকৃতিবাজেরা ব্যবহার করেছে কখনো জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা, কখনো ধর্মের মনগড়া প্রচারণা, কখনো সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত চিন্তা। যে জয় বাংলা স্লোগান ছিল আমাদের অস্তিত্বের একটি ঘোষণা, সেটি নিষিদ্ধ করা হলো। আমদানি করা হলো পাকিস্তানি চিন্তার 'জিন্দাবাদ' স্লোগানটি। 'সোনার বাংলা' কথাটি একটি ভুল কথা হিসেবে চিহ্নিত হলো। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো, যারা বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল এবং যারা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, সেই রাজাকার-আলবদরদের পুনর্বাসন করে এক সময় তাদের রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করা হলো। ইতিহাস বিকৃতির যেটুকু বাকি ছিল, এর মাধ্যমে তা সমাপ্ত হলো। গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের মিছিলে আসা এক মুক্তিযোদ্ধা এক টিভি চ্যানেলকে জানিয়েছিলেন, তিনি যদি জানতেন, ওরা একদিন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো গাড়িতে চড়বে, তাহলে তিনি মুক্তিযুদ্ধ করতেন না।

২

এবার ৭ মার্চ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারে যাতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি প্রচার হয়, সে জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছিলেন অনেক কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতিকর্মী। এই অনুরোধ রক্ষা হয়নি। তার একটি কারণ হয়তো এই যে, এখনো অনেকের মনে এ রকম একটি ধারণা রয়েছে, ৭ মার্চ আওয়ামী লীগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা, বাংলাদেশের জন্য নয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আমি অনুরোধ করব, এ ধরনের চিন্তাকে যেন তারা মোকাবিলা করে। ৭ মার্চ আওয়ামী লীগের নয়, যেমন বঙ্গবন্ধুও আওয়ামী লীগের নন। ৭ মার্চ ও বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ইতিহাসের অংশ। এই ইতিহাস দলমত নির্বিশেষে সব মানুষের। ৭ মার্চ আমাদের অস্তিত্বের জাগরণের একটি দীপ্তিমান দিন। এর মহিমা আমাদের সবার।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার না করলেও দেখলাম, বিটিভি ৭ মার্চকে গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ প্রচার করেছে। সামান্য হলেও, দেরিতে হলেও এ বিষয়টি অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এটি ছোট একটি পদক্ষেপ মাত্র। ইতিহাস বিকৃতির বিপরীতে সত্য প্রতিষ্ঠায় আমাদের আরও বহুদূর যেতে হবে।

৩
দেশে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চলছে। একটি প্রশংসনীয় কাজে নেমেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কিন্তু আমার বন্ধু মুকিতের প্রশ্ন, দুর্নীতি কি শুধুই আর্থিক অনিয়ম বা ক্ষমতার অপব্যবহার অথবা ত্রাণের টিন আত্মসাৎ? ইতিহাস বিকৃতি কি দুর্নীতি নয়?
মুকিত একাত্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে বিমানবাহিনীতে সার্জেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিল। সেখানে তাঁর ওপর অত্যাচার-নির্যাতন হয়েছে। 'দেশদ্রোহিতা'র অভিযোগে কোর্ট মার্শাল হয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে একবার সে বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার দিয়েছিল। মুকিত তখনো যেমন, এখনো কোনো দলের অনুসারী নয়। তাঁর বিশ্বস্ততা দেশের প্রতি, ইতিহাসের প্রতি। মুকিত অনেক দিন আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এখন সিলেটে থাকে। মাঝেমধ্যে অনেক উদ্বিগ্নতা নিয়ে আমাকে ফোন করে, জানতে চায় কোথায় কী হচ্ছে। দেশ নিয়ে তাঁর প্রচুর আশাবাদ।
দেশে যে একটা শুদ্ধি অভিযান চলছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর প্রত্যাশাও বেড়েছে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, দেশের ইতিহাস যাঁরা ইচ্ছেমতো পাল্টেছে, সত্যকে মুছে ফেলেছে, অসত্য-অর্ধসত্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, তাঁরা কি দুর্নীতিবাজের সংজ্ঞায় পড়ে না?
প্রশ্নটি, বোধকরি, অনেকেরই।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
কথা সাহিত্যিক। অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।